একালের নাটককে তাঁর মেলাবার বাসনা পরবর্তীকালে রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরিশচন্দ্র মধ্য পুষ্টতর হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫২-৯৪) মনোমোহন বসুর উত্তরসূরি ছিলেন। মনোমোহন বসু তিনি অনেকাংশে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, প্রহসন, গীতিনাট্য সব মিলিয়ে তিনি ত্রিশখানির বেশি নাটক লিখেছিলেন। কলকাতার ঠনঠনে-তে 'বীণা' একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাঁর প্রথম বিশিষ্ট নাটকগুলি হল : ফারসি গাথা নিয়ে রচিত *'লায়লামজনু'*, *'বেনজীর-বদরে-মুনীর'* (বাংলা ১৩০০), সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী অবলম্বনে পৌরাণিক নাটক 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে *'অনলে বিজলী'* (১৮৭৮), *'নরমেধযজ্ঞ'* (বাংলা ১২৯৮), *'হরধনুভঙ্গ'* (১৮৮১) এবং *'প্রহ্লাদচরিত্র'* (১৮৮৪) প্রভৃতি। *'হরধনুভঙ্গ'* নাট্যকার ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা অত্যন্ত নাট্যোপযোগী সংলাপ ব্যবহার করেছেন, গৈরিশছন্দের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণের প্রায় প্রত্যেকটি পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল ; তবে জনপ্রিয়তার বিচারে *'প্রহ্লাদচরিত্র'* শীর্ষস্থান লাভ করেছে। ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক নাট্যকার হিশাবেই রাজকৃষ্ণ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। যাত্রার ঢঙ মনোমোহনের মতো তিনিও চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন। উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ (action), চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা তাঁর কোন নাটকেই পাওয়া যাবে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫) প্রথম যুগের নাটসাহিত্যে অনেকখানি অবদান ছিল। যৌবনকালে পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গমঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যশালার অভিনয়াদির ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যতম উদ্যোগকর্তার। 'তাঁর নাট্যসৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য সেকালের পক্ষে দুর্লভ আধুনিক চেতনা, তথা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন প্লট ও সংলাপের রচনায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-মনস্কতা মূলে একটি আভিজাত্য ছিল, সে কেবল ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রার ফল নয়। শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সাহিত্য-চর্চার দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়েছিল।'[১১] তাঁর প্রধান অনুবাদ নাট্যগ্রন্থ হল : মহাকবি ভাসের নাটকাদি ছাড়া কালিদাসের *'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'*, *'মালবিকাগ্নিমিত্র'*, *'বিক্রমোর্বশী'*, ভবভূতির *'উত্তরচরিত'*, *'মালতী-মাধব'*, *'মহাবীর চরিত'*, শ্রীহর্ষের *'রত্নাবলী'*, *'নাগানন্দ'*, বিশাখ দত্তের *'মুদ্রারাক্ষস'*, শূদ্রকের *'মৃচ্ছকটিক'* ইত্যাদি। অনুবাদনাট্যগুলি উচ্চস্তরের না হলেও সেকালের মাপকাঠিতে প্রশংসনীয়ই বলা চলে।

তিনি রোমান্টিক আধা-ঐতিহাসিক নাটক ও প্রহসন রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রহসনগুলি একালেও মঞ্চস্থ হলে প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হয়। গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিতপূর্বে তাঁর রচিত নাটকগুলি বাংলাদেশের শৌখিন রঙ্গমঞ্চগুলিকে প্রাণবন্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে *'পুরুবিক্রম নাটক'* (১৮৭৪)—গ্রিকবীর সেকেন্দার ও পুরুর বিক্রম-বিষয় নিয়ে লেখা,—যাতে পুরুর মাধ্যমে স্বদেশচেতনা

ভিনয় ও নাট্যমঞ্চ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়,—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে জনই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। '*সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*' (১৮৭৫) নাটকে তদানীন্তন রেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রোধ-প্রকাশ এবং প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের অপমান ও আঘাত করা হয়। এর জন্যই নাট্যকার, পরিচালক অমৃতলাল বসু ও অভিনেতৃবন্দ-সমেত গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করতে বাধ্য হন। আসলে নাটকটি ছিল একটি রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী—সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রণয়, সঙ্কট ও পরিণতিতে মিলন এর বিষয়বস্তু। আর একটি নাটক *কাৎসরোজিনী* (১৮৭৭)। এ-নাটকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা থাকলেও প্রধানত এটি সামাজিক প্রণয়মূলক নাটক। অন্য একটি রচনা প্রহসন, নাম—'*দাদা ও আমি*' (১৮৮৮)। প্রহসনটিতে ভাবনার গভীরতার অভাব, স্থূল রুচির প্রকাশ ঘটেছে ; এ-তে কৌতুকসরই প্রধান।

অমৃতলাল বসু

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) নট ও নাট্য-নির্দেশক হিশাবে গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। নাটক ও নাট্যমঞ্চের উন্নয়নে তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। নাট্যরচনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গিরিশচন্দ্রের মতো গভীর ও ভাবাবেগ-ঋদ্ধ জীবনবোধ তাঁর ছিল না, —যে-জন্য 'সিরিয়াস' বিষয়ে নাটক রচনায় তিনি সফল হতে পারেননি, ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিষয়ে নিয়ে লেখা নাটকগুলি খুবই সাধারণ মান-সম্পন্ন। বরং জীবনের লঘুচপল রঙ্গকৌতুকপূর্ণ দিক নিয়ে নাটক রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রঙ্গব্যঙ্গে তাঁর ব্যাপক অধিকার ছিল। 'সিরিয়াস' বিষয়ে ছিল না।[১৮] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'তাঁর প্রতিভা কিন্তু পুরোপুরি প্রহসনকারের প্রতিভা।'[১৯] প্রহসন জাতীয় রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। নট ও নাট্যকার হিসাবে হাস্যরসের চর্চার জন্যই তিনি সেকালে 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক নাটকে তাঁর সাফল্য এসেছিল প্রধানত Satire বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সূত্র ধরে। আক্রমণাত্মক এবং আঘাতকারী হাস্যরস তাঁর হাতে ফুটত ভালই।

'*হরিশ্চন্দ্র*' (১৮৯৯), '*যাজ্ঞসেনী*' (১৯২৮) পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটকে সামান্য কৃতিত্বও দেখাতে পারেননি নাট্যকার। 'যাজ্ঞসেনী' তে 'সেকালের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনার বিবরণ' নিছক দুর্বোধ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'*চোরের ওপর বাটপাড়ি*' (১৮৭৬)-র মতো অল্প কয়েকটি রচনায় রুচিগত অশালীনতার পরিচয় থাকলেও অন্যান্য রচনায় ইউরোপীয় লেখকদের—বিশেষভাবে মলেঁয়ার-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। '*চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে*' (১৮৮৬) ও '*কৃপণের ধন*' (১৯০০) এ দুটি রচনায় কল্পনা ও বিন্যাসে কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।[২০]

অবশ্য জাতীয় দুর্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গ ও 'ক্যারিকেচার' করাই অমৃতলালের প্রহসনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। 'স্যাটায়ার'-এর মধ্যে দিয়ে তিনি দর্শকের চিত্তে গঠনমূলক চিন্তাভাবনাও সঞ্চার করতে চেয়েছেন। '*বিবাহবিভ্রাট*' (১৮৮৪) এধরনের একটি নাটক।

সামাজিক,নৈতিক, রাজনৈতিক প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে অমৃতলাল নাটক লিখেছেন। সামাজিক ব্যাধি—পরানুকরণ, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, স্বদেশিয়ানার নামে হুজুগ, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, আধুনিকতার নামে অনৈতিকতা—এসবই ছিল অমৃতলালের আক্রমণের লক্ষ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে প্রাচীনতা আচ্ছন্ন করেছে বটে, কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর জীবনাদর্শই তাঁকে উদ্‌বেজিত করেছে এসব ব্যাপারে। তাঁর নাটক-প্রহসনের গদ্য-পদ্য মেশানো ভাষা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।[২১] শব্দচ্ছটা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রশংসনীয়, সংলাপ অত্যন্ত সরস ও উপভোগ্য। গানের ব্যবহারে তাঁর নাটকগুলি সমৃদ্ধ।

অমৃতলালের নাট্যগুলি কয়েকটি ভাগ বিন্যস্ত করে নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল :

১. *সামাজিক নাটক*—*'হীরকচূর্ণ'* (১৮৭৫), *'তরুবালা'* (১৮৯১), *'খাসদখল'* (১৯০৬), *'নবযৌবন'* (১৯১৪) ইত্যাদি।

২. *পৌরাণিক নাটক* —*'হরিশচন্দ্র'* (১৮৯৯), *'যাজ্ঞসেনী'* (১৯২৮) ইত্যাদি।

৩. *প্রহসন* (স্যাটায়ার)—*'বিবাহ বিভ্রাট'* (১৮৮৪), *'বাবু'* (১৮৯৪), *'বৌমা'* (১৮৯৫), *'গ্রাম্যবিভ্রাট'* (১৮৯৮), *'সাবাশ আটাশ'* (১৯০০) ইত্যাদি।

৪. *ফার্স বা বিশুদ্ধ প্রহসন*—*'চোরের উপর বাটপাড়ি'* (১৮৭৬), *'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে'* (১৮৮৬), *'তাজ্জব ব্যাপার'* (১৮৯০), *'কৃপণের ধন'* (১৯০০), *'ব্যাপিকা বিদায়'* (১৯২৬)।

উল্লিখিত প্রহসনগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রহসন বাংলা রঙ্গমঞ্চে আজও সমাদরে অভিনীত হয়ে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, —সংক্ষেপে ডি. এল. রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা নাট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক নাট্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। বাংলা নাট্য-জগতে তখন গিরিশ-যুগ চলছে। গিরিশ-অনুগামী অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং ভিন্ন ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা প্রায়-প্রতিষ্ঠিত তখন বঙ্গরঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না-হয়েও নাট্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব।

ইউরোপীয় নাট্য-দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং নাট্যপাঠের পূর্বপ্রস্তুতি[২২] নিয়ে পুরাণ ও ভক্তিরসের কবল থেকে মুক্ত করে, এবং ইতিহাসের গতিচঞ্চল পটভূমিকায় স্থাপন করে বাংলানাটককে নূতন আঙ্গিকে আরও অগ্রবর্তী করবার প্রয়াসী হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অধিকতর যোগ্যতা ও দায়িত্ব সহকারে। কবিত্ব ও নাট্যধর্মের দুই আপাতবিরোধী গুণের সমবায়ে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপে নাট্যজগৎ একটি নতুন দিশা খুঁজে পায়, শুধু দৃশকাব্য নয়,—পাঠ্যকাব্য হিশাবেও নাটক একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয় তাঁরই প্রণোদনায়।